বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি

জাফর ওয়াজেদ

১৯৭২ সালের ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই ভারতের শৈলশহর সিমলায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্দিরা-ভুট্টো বৈঠক। ভুট্টোকন্যা ১৮ বছর বয়সি বেনজীরও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ইন্দিরা তাদের অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে ইন্দিরা ও ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয় অন্য কোনো উপদেষ্টা বা পরামর্শক ছাড়াই। এরপর উভয় সরকারের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের উপস্থিতিতে ইন্দিরা-ভুট্টোর মধ্যে আরও কয়েক দফা বৈঠক হয়। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে অতীতের সব সংঘর্ষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংকল্প ব্যক্ত করে ইন্দিরা ও ভুট্টো এক চুক্তি সই করেন। এটাই 'সিমলা চুক্তি' নামে খ্যাত। সামরিক ও রাজনৈতিক নানা দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নিয়ে বৈঠকে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের স্বীকৃতি বা যুদ্ধবন্দি ফেরত নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। চুক্তিতে কাশ্মীর সীমান্তসহ দ্বিপাক্ষিক কতিপয় বিষয়, যেমন: পাকিস্তানের যে অঞ্চল ভারত দখল করেছে, তা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সিমলা চুক্তির পরপরই বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।' প্রতিবাদ জানায় ভুট্টো, 'পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার করার কোনো অধিকার বাংলাদেশের নেই। কারণ, পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনীর কাছে।' তখন ভারত সরকার বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, 'প্রকৃত সত্য এই যে, পাকিস্তানবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে। আর এ কারণেই যুদ্ধবন্দিদের প্রশ্নে যে কোনো সিদ্ধান্ত ভারত ও বাংলাদেশের মতৈক্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে।'

যুদ্ধবন্দিদের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার সেদেশে আটকে পড়া ৪ লাখ বাঙালিকে তখন 'জিম্মি' করে। বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী সন্দেহে বহুজনকে বন্দিশালায় আটকে রাখে। প্রায় ১৬ হাজার বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা, যাদের একাত্তরেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল, তাদের পাকিস্তান ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তান সেখানে আটকে পড়া বাঙালিদের পরিবারসহ অমানবিক পরিবেশে বন্দিদশায় রাখে। অনেক বাঙালি আফগানিস্তানের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দেশে আসার পথে মারা যান। যারা আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে আসছিলেন, সেসব বাঙালিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ভুট্টো সরকার মাথাপিছু এক হাজার রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বাঙালি বিদ্বেষী অনেক পাকিস্তানি অসত্য অভিযোগ এনে প্রতিবেশী অনেক বাঙালিকে পরিবারসহ ধরিয়ে দেয়, যাদের পুলিশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি পাকিস্তানে বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন পেশ করেছিল। যাতে বলা হয়েছিল, 'হাজার হাজার বাঙালি বিনা বিচারে জেলে আটক আছে। পাকিস্তান ত্যাগ করতে পারে এই অভিযোগে বাঙালিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিনই তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং তারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে যারা উঁচুপদে রয়েছেন এবং বিত্তবান, তারা দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছেন।

আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত আনার জন্য তাদের পরিবার ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। প্রয়োজনে যুদ্ধাপরাধীদের বিনিময়ে তাদের স্বজনদের ফেরত আনার দাবি জানাতে থাকে। এই দাবিতে তারা সমাবেশ এবং অনশন পালন অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালের ৪ মে ঢাকাজুড়ে জনতার বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে। সরকারের ওপর তারা ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকে। আটকে পড়া বাঙালিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ তখন বিশ্ব জনমতের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাহায্য কামনা করে ভারতের মাধ্যমে আবেদন জানায়। অপরদিকে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় নিহত শহিদদের পরিবারগুলো সারাদেশে সভা-সমাবেশ করতে থাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন জারি করে। আলবদর, আলশামস, রাজাকারসহ দালালদের গ্রেফতার অব্যাহত রাখে এবং বিচারকাজ শুরু করে। চীনাপন্থি দল, উপদল ও গ্রুপ এবং মওলানা ভাসানী এই আইন বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন।

যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনাদের নিয়েও বিপাকে পড়ে ভারত। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এদের নিরাপত্তা, খাওয়া দাওয়াসহ ভরণপোষণ এবং ভাতা প্রদান করতে হতো ভারতকেই। এ খাতে প্রতিমাসে ব্যয় দাঁড়াচ্ছিল এক লাখ ডলারের বেশি। যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধবিরতি চুক্তিও সই হয়েছে, পরাজিতরা আত্মসমর্পণও করেছে, সুতরাং তাদের আর আটকে রাখার পক্ষে কোনো যুক্তিও ভারতের সামনে তখন ছিল না। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডাহেইম ভারত সফরে এসে ইন্দিরা

গান্ধীকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেন। ইন্দিরা অবশ্য সরাসরি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারত একতরফাভাবে কিছু করতে পারে না, করবেও না। ইন্দিরা জানতেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে শেখ মুজিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকায় ১৫০০ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যথাযথ তথ্যপ্রমাণ হাজির করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় তালিকা কমিয়ে আনে। শেষে তা দাঁড়ায় ১৯৫ জনে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত বাংলাদেশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি এই তালিকা করে। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যুদ্ধবন্দি বিষয়ে প্রথম আইন পাশ করা হয়।

যুদ্ধাপরাধী বিচারের পথ বন্ধ করতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় লেখা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান শেখ মুজিবকে পরামর্শদান উপলক্ষ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটি বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার করা হলে পাকিস্তানের হতোদ্যম জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তা সামলাতে পারবে না এবং এর ফলে উপমহাদেশে শান্তিস্থাপন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রত্যাহারের জন্য এটাই প্রথম বিদেশি চাপ তা নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন এ ধরনের পরামর্শ দিয়েছে, তাও নয়। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে গণহত্যায় লিপ্ত, তখন যেসব মুসলিম দেশ এসবেরও প্রতিবাদ করেনি, তারা ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর জন্য গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশেষত, মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভাগ্যের সঙ্গে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ে। তখন ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল টানা চারদিনের আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ও ভারতে যৌথ ঘোষণায় যুগপৎ প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব রেখে বলে, যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আটক সব নাগরিককে একযোগে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হবে। এর আগে তিনটি দেশ নাগরিকদের ৭টি ক্যাটাগরি প্রণয়ন করেছিল। এই তালিকায় আটকে পড়া বাঙালি ও বিহারি ছাড়াও পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি। তাই প্রস্তাব আনা হয়, ভারত সেদেশে আটক প্রায় ১০ হাজার বন্দিকে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করবে। বিনিময়ে পাকিস্তান সেদেশে আটকে থাকা বাঙালিদের মধ্যে দুই লাখকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। এছাড়া বাংলাদেশে আটক প্রায় ২ লাখ ৬৩ হাজার অবাঙালি তথা বিহারিকেও পাকিস্তান ফেরত নেবে। তারপরও বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে সরে আসেনি। এমনকি অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের এই প্রত্যাবাসন প্রস্তাবের বাইরে রাখে। যুগপৎ এই প্রত্যাবাসনে ভুট্টো সায় দিলেও মাত্র ৫০ হাজার বিহারিকে ফেরত নিতে রাজি হয়। তবে ভুট্টো বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

বাংলাদেশ ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস, দালালদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারি করে। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশের নয়া সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এতে ৪৭(৩) ধারা সংযুক্ত করা হয়। যাতে 'গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্রবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করার বিধান' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০ জুলাই জারি করা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩। ফলে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাদের জন্য পাকিস্তানি সেনা এবং দেশীয় যুদ্ধাপরাধী রাজাকার, আলবদরদের বিচারের ব্যবস্থা নেয়ার পথ সহজ হয়।

১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট যে দিল্লি চুক্তি সই হয়, তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে বাংলাদেশকে ছাড় দিতে হয়। চুক্তিতে বলা হয়, পাকিস্তান বাঙালি 'গুপ্তচরদের' বিচার করবে না। আর যে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ চিহ্নিত করেছে, তাদের বিচার হবে এবং বাংলাদেশেই হবে। তবে এ ব্যাপারে যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, তবেই তা হবে। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা এরপরও উল্লেখ করতে থাকে।

১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার নামে প্রথম সপ্তাহেই ১৪৬৮ বাঙালি এবং ১ হাজার ৩০৮ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির প্রত্যাবাসন ঘটে। বাংলাদেশ ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় পাকিস্তান দুই শতাধিক বাঙালিকে পণবন্দি হিসেবে জিম্মি করে রাখে। এসব সিদ্ধান্তের আগে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ভুট্টো একটি নতুন প্রস্তাবও রেখেছিল।

এতে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তান তার যে কোনো যুদ্ধবন্দির বিচার ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে, কারণ অভিযুক্ত অপরাধ পাকিস্তানের একটি অংশেই ঘটেছে। সুতরাং পাকিস্তান নিজে বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এদের বিচারে আগ্রহী, যা আন্তর্জাতিক আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে' (পাকিস্তান অ্যাফেয়ার্স, ১ মে ১৯৭৩)। কিন্তু টিক্কা খান পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান থাকাবস্থায় এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচারে পাকিস্তানি প্রস্তাবে সন্দেহ পোষণ করে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশে যে বিচার করা সম্ভব হবে না, তা বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ তখন আটকে পড়া নির্যাতিতসহ সাধারণ বাঙালিদের দেশে ফেরত আনা জরুরি হয়ে পড়েছে অথচ এই বাঙালিদের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে। এক দোটানায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। তথাপি যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার আগে পাকিস্তানের কাছে চারটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। প্রথমত, যুদ্ধাপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ খোলা রাখা এবং তৃতীয়, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য, চীনসহ অন্যান্য দেশে পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদান। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে শর্তসাপেক্ষে ভুট্টোকে একক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ভুট্টো সংসদে বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের দাবি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কোনো স্বীকৃতি নয়'।

দিল্লিতে ১৯৭৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে তিন দেশীয় প্রতিনিধিরা এক যুক্তঘোষণায় বলেন, 'উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেওয়া হবে'। অবশ্য এই যুক্তঘোষণার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রথম দলটি ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা পৌঁছে। কিন্তু এরপর প্রত্যাবাসন থেমে যায়। পাকিস্তান এ ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে, অথচ যুক্ত ঘোষণায় ত্রিমুখী লোক বিনিময় যুগপৎ পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ২২ অক্টোবর টোকিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে প্রতিটি বাঙালি ফেরত নিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি নাগরিকদের বিপুলসংখ্যককেই পাকিস্তান নিচ্ছে না'। এর কদিন পরই ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিক বিহারিদের পাকিস্তান ফেরত নেবে না'। অথচ প্রায় পাঁচ লাখ বিহারির মধ্যে অধিকাংশই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সেদেশে ফেরত যেতে আগ্রহী। বাংলাদেশের পক্ষে এদের ভরণপোষণ ভারবাহী হয়ে দাঁড়ায় গোড়াতেই।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনকালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও আটকে পড়া বাঙালিদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের জানান, 'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাঙালিদের দেশে ফেরাসহ অনেক বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন হবে। এই সম্মেলন শুরুর আগে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। আল্লাহর নামে এবং দেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করছি।...আমি বলছি না যে, এটি আমি পছন্দ করছি। আমি বলছি না আমার হৃদয় আনন্দিত। এটি আমার জন্য একটি আনন্দের দিন নয়, কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বদলাতে পারব না।' ভুট্টোর ঘোষণার আগের রাত অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সৌদি আরব, মিসর, ইন্দোনেশিয়াসহ ৩৭টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উভয় দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থন হয়।

দিল্লিচুক্তিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও ভুট্টো তা করেনি। অপরদিকে, চুক্তিতে আটকে পড়া বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর উল্লেখও রয়েছে। ভুট্টো চুক্তির কোনোটিই আসলে কার্যকর করেনি। কারণ, ভুট্টো বলেছিল, চুক্তির আগে পাকিস্তান নিজে তার জাতীয় আইনের ভিত্তিতে তাদের বিচার করবে। ভুট্টো তো বাহাত্তর সাল থেকেই নিজে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কথা রাখেননি। সময়টা ছিল বাংলাদেশের প্রতিকূলে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা নাজুক ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া আর কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। এমনকি মুসলিম দেশগুলোও নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মতো বাস্তব অবস্থা এবং উপকরণগত সহায়তাও বাংলাদেশের ছিল না।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভুট্টো জিম্মি করে রেখেছিল। আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ বিষয়ে সেভাবে এগিয়ে আসেনি। ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানের ওপর চাপ বহাল রেখেছিল। কিন্তু এই বাঙালিদের ফেরত আনার জন্যই সেদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী তাদের বিচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। যদিও তাদের প্রায়োজনই আর জীবিত নেই। কিন্তু মরণোত্তর বিচার কাজটি পাকিস্তানের করা উচিত তাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন, তেমনই বিশ্বের শান্তির স্বার্থেও।

যুদ্ধাপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার নজির বিশ্বে আর নেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও শরণার্থী কমিশন এবং রেডক্রস তাদের নিয়ে কাজ করে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হয়। রেডক্রস তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টার অংশ হিসেবে নাগরিকত্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করলে তারা নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক পরিচয় দিয়ে সে দেশে ফেরত যেতে চায়। সেসময় থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারিদের 'আটকে পড়া পাকিস্তানি' বলে অভিহিত করা হয়।

এদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ৬৬টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়। এর মধ্যে ঢাকার মিরপুরে ২৫টি, মোহাম্মদপুরে ৬টি ক্যাম্প। ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস বিদায় নিলে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে জেদ্দাভিত্তিক সংগঠন রাবেতা আল আলম ইসলাম জরিপ চালায়। তারা তালিকাও প্রণয়ন করে। সর্বশেষ ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার উর্দুভাষী পাকিস্তানি ৮১টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। এদের ফেরত নিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়াউল হক সত্তর দশকে একটি তহবিল গঠন করেছিলেন; কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ পুনর্বাসন থমকে থাকায় তা ব্যয় হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ক্যাম্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চলছে।

১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী, ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৯ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক দাবি করে সে দেশে ফিরে যেতে চায়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় একাধিক চুক্তি করে। ইন্দো-পাক অ্যাগ্রিমেন্ট ১৯৭৩, জেদ ট্রাইপাটাইট অ্যাগ্রিমেন্ট অব বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ১৯৭৫ এই চুক্তিগুলোর অন্যতম। ১৯৭৪ সালে তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মাত্র তিন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তানে ফেরত নিতে সম্মত হয়। চুক্তির আওতায় পাকিস্তান ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬৩৭ জনকে ফেরত নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে মাত্র ১ লাখ ২৬ হাজার ৯৪১ জনকে ফেরত নেয়। বাকি ৪ লাখ ফেরত নেয়নি।

১৯৯২ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয় যে, ৩০০ বিহারি পরিবারকে পাকিস্তানে ফেরত নেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মাত্র ৫০ পরিবারকে ফেরত নেওয়ার পর প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ বিষয়টি উত্থাপন করলেও সন্তোষজনক কোনো সুরাহা হয়নি। আটকে পড়া সবাইকে ফেরত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পাকিস্তান উপেক্ষা করে আসছে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারের সহযোগী বিহারিদের বাংলাদেশ জিম্মিও করেনি কিংবা যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের বিচারের আওতায় আনেনি।

#

লেখক- মহাপরিচালক পিআইবি

২৮.১২.২০২১ পিআইডি ফিচার